আখবার আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা হুযুরের সর্বদা রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

اَللّٰهُمَّ اَيِّدْ اِمَامَنَا بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ عُمْرِهٖ وَاَمْرِهٖ۔

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

সংখ্যা 2

বদর

কাদিয়ান সাপ্তাহিক

The Weekly BADAR Qadian Bangla

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার, 17 মার্চ, 2016 7 জামাদি আস-সানি 1437 A.H

এই সকল বর্ণনার পিছনে আমার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'লা কাহাকেও ভালবাসার জন্য এই শর্ত রাখিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তিকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুবর্তিতা করিতে হইবে। বস্তুত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানাইয়া দেয়।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এখানে আমি ইহাও বলিতেছি যে, উহা কোন বস্তু কোন বস্তু যাহা আঁ হযরত (সাঃ)-এর পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতার পর সর্ব প্রথমে হৃদয়ে জন্ম লাভ করে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে উহা সুস্থ হৃদয়। অর্থাৎ ঐ হৃদয় হইতে পৃথিবীর ভালবাসা তিরোহিত হইয়া যায় এবং উহা এক অনন্ত ও স্থায়ী স্বাদের অন্বেষণকারী হইয়া যায়। ইহার পর এই সুস্থ হৃদয়ের দরুণ একটি সচ্ছ ও পরিপূর্ণ ঐশী ভালবাসার অর্জিত হয়। এই সকল পুরস্কার আঁ হযরত (সাঃ)-এর আজ্ঞানুবর্তিতার দরুন উত্তরাধিকার রূপে পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'লা নিজেই বলেন, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আলে ইমরান:৩২) অর্থাৎ তাহাদিগকে বলিয়া দাও যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আস, আমার আনুবর্তিতা কর যাহাতে খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন বরং একতরফা ভালবাসার দাবি সম্পূর্ণরূপে একটি মিথ্যা কথা ও গাল-গল্প। যখন মানুষ সত্যকারভাবে খোদা তা'লাকে ভালবাসে তখন খোদাও তাহাকে ভালবাসেন। তখন পৃথিবীতে তাহার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তৃত করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষের হৃদয়ে তাহার জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করা হয়। তাহাকে আকর্ষণ করার শক্তি দান করা হয়। তাহাকে একটি জ্যোতিঃ দান করা হয় যাহা সদা-সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। যখন একজন মানুষ খাঁটি অন্তঃকরণে খোদাকে ভালবাসে এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর তাহার প্রাধান্য দেয় ও গায়ের উল্লাহর (আল্লাহর ব্যতীত অন্য সব কিছুর) মহিমা ও প্রতাপ তাহার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না, বরং সেই সকলকে মৃত কীটের চাইতেও অধম মনে করে, তখন খোদা, যিনি তাহার হৃদয় দেখেন তিনি এক ভারী জ্যোতিঃ র্বিকাশের সহিত তাহার উপর অবতীর্ণ হন। যখন একটি স্বচ্ছ আয়নাকে এমনভাবে সূর্যের বিপরীত দিকে রাখা হয় যে, সূর্যের প্রতিবিম্ব উহার উপর পরিপূর্ণরূপে পতিত হয়, তখন রূপকভাবে বলা যাইতে পারে ঐ সূর্যই যাহা আকাশে আছে তাহা ঐ আয়নাতেও বিদ্যমান। অনুরূপভাবেই খোদা এইরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাহার হৃদয়কে নিজের আরশে (অর্থাৎ গুণাবলী পবিত্র অবস্থান স্থলে) পরিণত করেন। ইহাই ঐ উদ্দেশ্য যাহার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। পূর্বের ধর্ম গ্রন্থসমূহে যেখানে পরিপূর্ণ সত্যবাদীগণকে খোদার পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে উহারও এই অর্থ নহে যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে খোদার পুত্র। কেননা, ইহাতো কুফরী। তিনি পুত্র ও কন্যা হইতে পবিত্র। বরং ইহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পরিপূর্ণ সত্যবাদী স্বচ্ছ আয়নায় খোদা প্রতিবিম্ব রূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। এক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব, যাহা আয়নায় প্রতিফলিত হয়, তাহা রূপক অর্থে যেন তাহার পুত্র। কেননা, যেভাবে পুত্র পিতা হইতে জন্ম লাভ করে ঠিক তদ্রুপই প্রতিবিম্ব নিজের আসল সত্তা হইতে জন্ম লাভ করে। অতএব যখন এইরূপ হৃদয়, যাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয় এবং যাহাতে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না, তখন ইহাতে আল্লাহ তা'লার জ্যোতির প্রতিফলন ঘটে। এমতাবস্থায় ঐ প্রতিফলিত ছবি রূপক অর্থে আসল সত্তার জন্য পুত্র রূপে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই তওরাতের বলা হইয়াছে যে, ইয়াকুব আমার পুত্র বরং জৈষ্ঠ্য পুত্র। এই অর্থেই ঈসা ইবনে মরিয়মকে ইঞ্জিলে পুত্র বলা হইয়াছে। খোদার কিতাবসমূহে রূপক অর্থেই ইবরাহীম,ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, দাউদ, সোলাইমান প্রমূখ নবীকে খোদার পুত্র বলা হইয়াছে। এই সীমা পর্যন্তই খৃষ্টানদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল।

অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ) ও তাদের অন্যতম। এমতবাস্থায় তাহার সম্পর্কে কোন আপত্তি উচিত না। কেননা, যে ভাবে রূপক অর্থে এই সকল নবীকে পূর্বের নবীগণের কিতাবে পুত্র রূপে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেইভাবে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের নবী (সাঃ) কে খোদা রূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। সত্য কথা এই যে, ঐ সকল নবী খোদার পুত্র নহেন এবং আঁ হযরত (সাঃ) খোদা নহেন। বরং এই সকল রূপক ভালবাসার প্রতীক। এইরূপ শব্দ খোদা তা'লার বাক্যে অনেক আছে। যখন মানুষ খোদা তা'লার প্রেমে এইরূপ বিলীন হইয়া যায় তাহার নিজের বলিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই বিলীনতার অবস্থায় এইরূপ শব্দাবলী বলা হইয়া থাকে। কেননা, এই অবস্থায় মধ্যেখানে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না, যেমন, আল্লাহ তা'লা বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا

(আল-যুমার: ৫৪) । অর্থাৎ, এই সকল লোককে বল, হে আমার বান্দারা খোদার দোয়া হইতে নিরাশ হইয়ো না। খোদা সকল পাপ ক্ষমা করিবেন। এখন দেখ, এই জায়গায় 'ইয়া ইবাদীয়াল্লাহ'-র (অর্থাৎ হে আল্লাহ তা'লার বান্দারা) স্থলে 'ইয়া ইবাদী' (হে আমার বান্দারা) বলা হইয়াছে। যদিও মানুষ খোদার বান্দা এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর বান্দা নহে। কিন্তু ইহা রূপক অর্থে বলা হইয়াছে। অনুরূপভাবেই আল্লাহ তা'লা বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

(আল-ফাতহ্: ১১) অর্থাৎ যাহারা তোমার হাতে বয়াত করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে খোদার বয়াত করে। ইহা খোদার হাত, যাহা তাঁহার হাতের উপর আছে। এখন এই সকল আয়াতে আঁ হযরত (সাঃ)-এর হাতকে খোদার হাত সাব্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রকাশিত যে, উহা খোদার হাত নহে।

অনুরূপভাবে এক জায়গায় আল্লাহা তা'লা বলেন,

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا (আল-বাকারা: ২০১) । সুতরাং তোমরা খোদাকে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতাকে স্মরণ করিয়া থাক। অতএব এই স্থানে খোদা ত'লাকে পিতার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত করা হইয়াছে এবং রূপককও কেবল সাদৃশ্যের সীমা পর্যন্ত সীমিত।

অনুরূপভাবে খোদা তা'লা ইহুদীদের দ্বারা বর্ণিত একটি কথাকে শিক্ষারূপে কুরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ কথাটি এই যে, نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ (আল-মায়েদা: ১৯) । অর্থাৎ আমরা খোদার পুত্র এবং তাঁহার প্রিয়। এই জায়গায় খোদা

এর পর আটের পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জ্ঞানভিত্তিক, হযরত মুসলেহ মওউদ (সাঃ) সংক্রান্ত একটি মহান ঐশী নিদর্শনের পটভুমি এবং গুরুত্ব

এহসানুল্লাহ দানিশ, মুরুব্বী সিলসিলা

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁর যুগে জ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিভিত্তিক এবং প্রমাণভিত্তিক দিক থেকে জয়যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ১৮৮৫ সালে ইসলামের সত্যতা এবং ইসলামের প্রবর্তক হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য অমুসলিমদের কাছে নিদর্শন দেখার জন্য আমন্ত্রন জানান এবং বিশেষ করে নিজের বিরোধীদেরকে এবং ইসলামের অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি সত্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে এসে এক বছর সময় কাল পর্যন্ত অতিবাহিত করবে, তাকে খোদা তা'লা এমন নিদর্শন দেখাবেন যা তার উপর আঁ হযরত (সাঃ) এর সত্যতা প্রকাশ করে দিবে। তিনি (আঃ) এ বিষয়ে সারা পৃথিবীতে ইশতেহার প্রচার করেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় কাদিয়ানের আর্য এবং অন্যান্য অ-মুসলিমরা তাঁর নিকট পত্র মাধ্যমে নিবেদন করেন যে, আমরা যেহেতু আপনার সঙ্গেই সহাবস্থান করি, অতএব অন্যদের তুলনায় আমরা নিদর্শন দেখার বেশি অধিকার রাখি। তারা লিখেন-" যেরূপ পরিস্থিতিতে আপনি লন্ডন এবং আমেরিকা পর্যন্ত এই বিষয়টির রেজিস্টার্ড পত্র প্রেরণ করে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যে,আপনাদের মধ্যে যারা সত্যসন্ধানী আছেন এবং তারা এক বছর কাল পর্যন্ত আমার কাছে কাদিয়ানে এসে অবস্থান করবেন খোদা তা'লা তার উপর ইসলামের সত্যতার নিদর্শন অবশ্যই প্রকট করে দিবেন যা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে। আমরা আপনার একই শহরের বাসিন্দা এবং প্রতিবেশি। লন্ডন এবং আমেরিকার অধিবাসীদের তুলনায় আমাদের এই অধিকার আমাদের বেশি প্রাপ্য। আমরা আপনার নিকট কসম খেয়ে বলতে পারি যে আমরা যেহেতু সত্যান্বেষী অতএব, আমাদের জন্য এতটুকু নিদর্শনই যথেষ্ট যার জন্য আকাশ ও পৃথিবীকে ওলট পালট হতে হয় না, প্রকৃতরি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করার প্রয়োজন হয় না। তবে এতটুকু নিদর্শন অবশ্যই চাই যা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে। যার দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেই সত্য ও পবিত্র পরমেশ্বর আপনাকে সত্য পথের দিশা দিতে অকৃত্রিম ভালবাসা এবং করুনাবশতঃ আপনার দোয়া সমূহকে গ্রহণ করে থাকেন এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার পূর্বাহ্নেই সে সম্পর্কে অবগত করেন কিম্বা আপনাকে কিছু গোপন বিশেষ রহস্যাবলী সম্পর্কে অবগত করেন অথবা এমন অনন্য পন্থায় আপনার সাহায্য ও সমর্থন করেন যেরূপে তিনি আদিকাল থেকেই তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত, তাঁর দরবারে সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ, তাঁর ভক্তবর্গ এবং বিশেষ বান্দাদের সঙ্গে করে থাকেন। "

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯২-৯৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এই পত্রের উত্তরে লেখেন,

" আপনাদের পত্র প্রাপ্ত হয়েছি যাতে আপনারা ঐশী নিদর্শন দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আমি পূর্ণ কৃতজ্ঞতসহকারে এই বিষয়টিকে মঞ্জুর করছি। এবং আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আপনারা যদি এই অঙ্গিকার সমূহ রক্ষা করার প্রতি সৎ থাকেন যেগুলি আপনারা পত্রে উল্লেখ করেছেন তবে অবশ্যই একবছরের মধ্যে মহা শক্তিশালী আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন এমন নিদর্শন প্রকাশ করবে যা মানবীয় শক্তির উর্দ্ধে হবে। হে মহাশক্তিশালী ও দয়াময় খোদা আমাদের ও তাদের মধ্যে সত্য মীমাংসা কর এবং তুমিই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। তুমি ভিন্ন কেউ মীমাংসা করতে পারে না। আমীন সুম্মা আমীন॥"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৫-৯৬)

সুতরাং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বিরোধী ও অস্বীকারকারীদেরকে নিরুত্তর করে দেন। এবং ইসলামের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নির্দেশে চিল্লাহ কশি এবং বিশেষ দোয়ার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান থেকে হোশিয়ারপুরের যাত্রা করেন এবং পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ সংযোগহীন হয়ে চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার দরবারে এক মহান নিদর্শন প্রকাশের জন্য দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। আল্লাহ তা'লা তাঁর দোয়া গ্রহণ করেন এবং অসাধারাণ গুণাবলী ও আল্লাহর কৃপাভাজন এক মহান পুত্র সন্তান প্রদান করার শুভসংবাদ দেন। এই শুভ সংবাদ তিনি (আঃ) ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সালে একটি ইশতেহারের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে দু'জন পুত্র সন্তানের সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। যাদের মধ্যে একজনের জন্য বাল্যকালেই মৃত্যু নির্ধারিত ছিল। অপরদিকে দ্বিতীয়জন অসাধারণ জীবন লাভ করবে বলে উল্লেখ ছিল। সে অসাধারণ গুণের অধিকারী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীতে একথারও উল্লেখ ছিল যে, সে পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করবে। জাতি সমূহ তার থেকে বরকত লাভ করবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ তা'লা মসীহ মওউদ (আঃ) এর পুত্রের জন্য এমন বহু অসাধারণ গুণাবলীর ধারক শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন যেগুলির মধ্যে একটি গুণও এমন নয় যা মানবীয় হস্তক্ষেপের কারণে পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল এবং কোন ব্যক্তিই নিজের সন্তান সম্পর্কে এমন নিজের পক্ষ থেকে এমন দাবী করতে পারে না যে সে এই ধরণের গুণাবলীর অধিকারী হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীকে মৃতদের জীবিত করা অপেক্ষা শত সহস্র গুণ উচ্চ পর্যায়ের নিদর্শন বলে আখ্যায়িত করে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" এখানে চক্ষু উন্মেলিত করে দেখা দরকার যে, এটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং একটি মহান ঐশী নিদর্শন যা মহা পরাক্রমশালী ও সম্মানিত খোদা তা'লা আমাদের নবী করীম (সাঃ)-এর সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য প্রদর্শন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই নিদর্শন একজন মৃতকে জীবিত করা অপেক্ষা শত সহস্র গুণ শ্রেয় ও পূর্ণ। এই স্থানে আল্লাহ্‌র কৃপায় হযরত খাতামুল আম্বিয়া (আঃ) -এর কল্যাণে আল্লাহ তা'লা এই অধমের দোয়াকে গ্রহণ করে এমন কল্যাণময় জীবন প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন কল্যাণ সমগ্র পৃথিবীতে প্রসার লাভ করবে। তথাপি যদিও এই নিদর্শন মৃতদের জীবিত করার সদৃশ প্রতীয়মান হয় কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, এই নিদর্শন মৃতদের জীবিত করা অপেক্ষা সহস্রগুণ উত্তম। দোয়ার মাধ্যমে মৃতের আত্মাই তো ফিরে আসে এবং এখানেও দোয়ার মাধ্যমে একটি আত্মাকেই আহ্বান করা হয়েছে। কিন্তু এই সকল আত্মা এবং সেই আত্মার মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব রয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে যারা গোপনে ধর্মচ্যুত তারা আঁ হযরত (সাঃ)-এর অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রকাশ পেতে দেখে আনন্দিত হয় না বরং তারা এই ভেবে বড়ই বিষন্ন হয় যে এমনটি কেন ঘটল।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯২-৯৩)

ইসলামের বিরোধী বিশেষ করে হিন্দুদের জন্য এই বিষয়টি যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল যে, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তাদের আবেদন স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং ঐশী নিদর্শনের জন্য প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু শত্রুতা এবং বিদ্বেষ মানুষের দৃষ্টি শক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং শত্রুতা মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সুতরাং ইসলামের একজন ঘোর বিরোধী সত্যকে গোপন করার এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে।....অর্থাৎ পন্ডিত লেখরাম পেশাওয়ারী। ... যে পূর্বেও আঁ হযরত (সাঃ) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপলাপ করার জন্য কুখ্যাত ছিল। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ১৮৮৫ সালে অ-মুসলিমদেরকে নিদর্শন দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান তখন লেখরামও ১৮৮৫ সালে সেই নিদর্শন দেখার জন্য কাদিয়ানে আসে। কিন্তু কিছু দিন বিরোধীদের কাছে থেকে দুর্মুখতার পরিচয় দিয়ে ফিরে যায়। তথাপি সে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) -এর নিকট বারংবার নিদর্শন দেখতে চায়ত। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে যখন একজন অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পন্ন অতুলনীয় মহান প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করেন যিনি তাঁরই বংশধর হবেন বলে উল্লেখ করেন এবং যার সম্পর্কে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তিনি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে বলেন যে, সেই পুত্র নয় বছর কালের মধ্যে ভুমিষ্ঠ হবে এবং যার পবিত্র জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত ইসলামের সত্যতার প্রমাণ হবে। সেই সময় লেখরাম সততা এবং খোদা ভীরুতা অবলম্বন না করে অত্যন্ত দুর্মুখতা প্রদর্শন করা শুরু করে। ইসলামের সত্যতার জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। সত্যতা এবং সত্যান্বেষণের দাবী মেনে খোদা তা'লার দু'পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষের সত্যতা প্রকাশ করেন তার জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কিন্তু লেখরাম অধৈর্য্যতার পরিচয় দেয় এবং মীমাংসার পূর্বেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ আরম্ভ করে। সে তার ইশতেহারে একথাও লিখে ফেলে যে, প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা, খোদা তা'লা আমাকে অবগত করেছেন যে, মির্যা সাহেবের কোন সন্তান হবে না এবং তিন বৎসর কালের মধ্যে অবিশিষ্ট বংশধরেরাও ধ্বংস হবে এবং তিনি নিঃসন্তান থাকবেন।

(তাকযীব বারাহীনে আহমদীয়া, মুসাফ্‌ফা লেখরাম, পৃষ্ঠা-৩১১)

(অবশিষ্ট পরের সংখ্যায়)

জুমআর খুতবা

খোদা তা'লা যখন নিজের পক্ষ থেকে কাউকে দন্ডায়মান করেন অথবা যখন নবীদের প্রেরণ করেন তখন তিনি তাদের সাহায্য এবং সমর্থনও করে থাকেন। আর সত্য প্রকাশের জন্য পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠীকে তাদের অপকর্মের জন্য যদি শাস্তি দিতে চান তাহলে শাস্তি দেন, পরোয়া করেন না।

ইসলামী শিক্ষা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অধিকার নেওয়ার পরিবর্তে বা অধিকার দাবি করার ক্ষেত্রে নাছোড় আচরণ না করে অন্যের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

এটি অ-ইসলামিক মনোবৃত্তি যে, অন্যের অধিকারকে যেহেতু আমরা দীর্ঘকাল থেকে কুক্ষিগত করছি, সেটিকে ভোগ করছি, আর এটিকে নিজের অধিকার মনে করার এক মনোবৃত্তি আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে তাই অন্যের প্রাপ্য আমরা তাকে দিতে পারি না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো অনেক সময় আমাদের বিচার বিভাগে এমন অনেক মোকদ্দমা বা মামলা আসে যে, ভাই ভাইয়ের অধিকারকে পদদলিত করে বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য অধিকারকে তারা কুক্ষিগত করে। আমরা যদি এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করি তাহলে আমাদের বিচার বিভাগের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা।

এটি অ-ইসলামিক মনোবৃত্তি যে, অন্যের অধিকারকে যেহেতু আমরা দীর্ঘকাল থেকে কুক্ষিগত করছি, সেটিকে ভোগ করছি, আর এটিকে নিজের অধিকার মনে করার এক মনোবৃত্তি আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে তাই অন্যের প্রাপ্য আমরা তাকে দিতে পারি না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে থাকে সে আমার এবং তোমার প্রশ্ন তোলে না, সে তো খোদা তা'লার বান্দা হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ্ যে হয় তার নিজের বলতে কিছুই থাকে না, সব খোদা তা'লার হয়ে থাকে। আমাদের এই কথা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে পারি, আমরা কিভাবে নিজেদের হঠকারিতা এবং আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্ট করতে পারি। নির্বাচনের সময় এমন প্রশ্নাবলী উঠে থাকে যখন কোন সময় অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তখন মানুষ এমন প্রশ্নের অবতারণা করে। এই বছরটি আমাদের জামাতে নির্বাচনের বছর। এ বছর নির্বাচন হবে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবার উচিত নিজেদের চিন্তা-ধারার সংশোধন করা। দোয়ার পর সকল প্রকার সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের নির্বাচনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন, এরপর যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় তা সানন্দে গ্রহণ করুন।

কর্মকর্তা হোক বা কোন ওহদাদার হোক অন্যদের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে অর্থাৎ কর্মকর্তারা যেন কেবল অধীনস্তদের ওপরই নির্ভর না করে বরং তাদের নিজেরও সরাসরি সব কাজের নিগরানী এবং তত্ত্বাবধান করা উচিত, কাজে জড়িত থাকা উচিত, তাহলেই কাজ সঠিকভাবে সমাধা হওয়া সম্ভব।

অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, চাওয়া সত্ত্বেও কাজ হয় না তাই তাদের সেই ইচ্ছা এবং চাওয়াতে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকে না। এই চাওয়ার সাথে চাওয়ার যে অনুসঙ্গ আছে তা থাকে না অর্থাৎ সংকল্প, প্রত্যয় থাকে না, পরিশ্রম করা হয় না, শুধু মনে মনে চায় আর চাওয়াই সার।

নামাযের প্রশ্ন যখন আসে, অনেকে আমার কাছে এসে বলে যে, দোয়া করুন, আমরা রীতিমত নামায পড়তে চাই কিন্তু আমরা রীতিমত নামায পড়তে পারি না, অন্য কাজ যখন চাই তা করে নিই কিন্তু নামাযও পড়তে চাই। তারা যেহেতু পুরো আন্তরিকতার সাথে চায় না, এর জন্য সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করে না এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চায় না তাই নামাযের অভ্যাস রপ্ত হয় না, এমন লোকদের চাওয়া আসলে না চাওয়ারই নামান্তর। তাই আসলে মানুষের নিজেরই আলস্য হয়ে থাকে এবং ঔদাসিন্য থেকে থাকে যেটিকে অনর্থক চাওয়ার বা ইচ্ছার নাম দেওয়া হয়।

এটিও একটি হাস্যকর বিষয় যে, একবেলা এসে নামায পড়ে মনে করা বসলাম যে, আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে ফেলেছি, এটি তাদের জন্য, যারা মনে করে মসজিদে গিয়ে একটি নামায পড়ে ফেললাম আর ফরয দায়িত্ব পালন হয়ে গেল আর এটিই যথেষ্ট। সুতরাং যারা রীতিমত নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে না তারা এমন লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত। পাঁচ বেলার নামায প্রত্যেক সাবালক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। পুরুষদের জন্য মসজিদে এসে বা জামাতের সাথে নামায পড়া আবশ্যক, এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত বা এটি বল যে, আমরা সাবালক নই বা এটি বলা উচিত যে, আমাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই, তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু এই উভয় কারণ যদি না থাকে সর্বত্র জামাতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা থাকা উচিত।

সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, সত্যিকার মু'মিন সে, যে নেক কাজ করে, পূর্বের চেয়ে অধিক নেক কাজ করলে পূর্বের চেয়ে অধিক বিনয় এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদার কাছে অধিক নেক কর্মের দোয়া করা উচিত এবং এক মু'মিন তাই করে থাকে।

ঈমান আমাদের কর্মের ফলে লাভ হয় না বরং খোদা তা'লার করুণার ফলে লাভ হয়, এটি একটি মৌলিক কথা যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের কর্ম যতই হোক না কেন খোদার দয়া যদি না হয়, তাঁর কৃপা যদি না থাকে, ঈমান কোনও ভাবেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

অতএব মৌখিকভাবে আনুগত্য করা বা মৌখিকভাবে অভিশাপ দেওয়া কোন অর্থ রাখে না, আসল জিনিস হলো কর্ম। মৌখিকভাবে যে আনুগত্যের দাবি করে সে অনেক সময় সবচেয়ে বড় মুনাফিক বা কপটও হতে পারে।

আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। আমাদের জীবদ্দশায় আসুক বা পরে কিন্তু এই বিজয়ের অংশ হওয়ার জন্য আমাদেরকে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যেন বংশ পরম্পরায় এটি প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের যুগে যদি বিজয় না আসে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সেই বিজয় দেখে।

কয়েক বছর পূর্বে আমিও জামাতকে রোযা রাখার কথা বলেছিলাম যে, রোযা রাখা উচিত। আর জামাতে আজও কেউ কেউ এমন আছে যারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারা রোযা রাখে। আমাদের এখন অন্তত পক্ষে সপ্তাহে একটি করে হলেও বিশেষভাবে ৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত ৪০টি রোযা রাখা উচিত। আর দোয়া করুন, নফল পড়ুন এবং সদকা দিন কেননা কোন কোন স্থানে জামাত এখন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন, কোন কোন জায়গায় পরিস্থিতি কঠিনতর হচ্ছে। আমরা যদি আল্লাহ্‌র দরবারে আহাজারী করি তাহলে যেভাবে বাচ্চার ক্রন্দনে মায়ের বক্ষে দুধ নেমে আসে তেমনিভাবে আমাদের প্রভুর সাহায্যও আকাশ থেকে নাযেল হবে আর সেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা যা আমাদের পথে বিরাজমান তা দূর হবে। পূর্বেও দুরীভূত হয়েছে আর এখনও তা দুরীভূত হবে।

খোদার দরবারে অনেক বেশি আহাজারী এবং ক্রন্দনের প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের এ দিকে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে খোদা তা'লার দরবারে ঝুকুন, নফল পড়ুন, সদকা দিন, রোযা রাখুন। দোয়া ছাড়া এবং খোদার রহমতকে আহ্বান করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'লা সেই সকল আহমদীদেরকে, যেখানে যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে বা যেসব দেশে হচ্ছে বা যেসব স্থানেই এই যুলুম এবং অত্যাচার আর নির্যাতন চলছে, এমন দোয়া করার তৌফিক দিন যা খোদার আর্‌শকে প্রকম্পিত করবে আর মোটের ওপর সারা পৃথিবীর আহমদীদের জামাতের উন্নতি এবং যুলুম আর নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ১২ ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (১২ তবলীগ,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর বিভিন্ন খুতবা এবং বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন শিক্ষনীয় কথা বা কাহিনী তুলে ধরেন যাআমি বিভিন্ন সময় বর্ণনা করে আসছি। আজও একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক খুতবায় এই বিষয়টি বর্ণনা করেন যে, খোদা তা'লা যখন নিজের পক্ষ থেকে কাউকে দন্ডায়মান করেন অথবা যখন নবীদের প্রেরণ করেন তখন তিনি তাদের সাহায্য এবং সমর্থনও করে থাকেন। আর সত্য প্রকাশের জন্য পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠীকে তাদের অপকর্মের জন্য যদি শাস্তি দিতে চান তাহলে শাস্তি দেন, পরোয়া করেন না। এই প্রেক্ষাপটে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত একটি কাহিনীর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শৈশবে আমাদের কাহিনী বা গল্প শোনার সুগভীর আগ্রহ ছিল। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অনুরোধ করলে তিনি আমাদের এমন সব কাহিনী শুনাতেন যা শুনে শিক্ষা অর্জন হয়। সেসব কাহিনীর মাঝে একটি কাহিনী এখন আমার মনে পড়ছে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মুখে আমি শুনেছি। তিনি (আ.)বলতেন, হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে এ কারণে তুফান এসেছে যে, মানুষ তখন মারাত্মকভাবে নোংরা প্রকৃতির হয়ে যায় এবং পাপে লিপ্ত হয়। তাদের পাপের মাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাদের মূল্যও হারিয়ে যেতে থাকে, এটি একটি কাহিনী যে, অবশেষে একদিন কোন পাহাড়ের চূড়ায় একটি গাছ ছিল যার ওপর একটি পাখির বাসায় এক চড়ুই ছানা ছিল। সেই ছানার মা কোন জায়গায় গিয়েছে আর ফিরে আসতে পারেনি, হয়তো মারা গেছে বা অন্য কোন কারণে তার ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। পরে এই চড়ুই ছানার পিপাসা লাগে এবং পিপাসায় ছটফট করতে করতে সে নিজের ঠোট খুলে। এটি দেখে আল্লাহ্ তা'লা ফিরিশতাদের নির্দেশ দেন যে, যাও পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ কর আর এত পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ কর যেন এই পাহাড়ের চূড়ায় যে বৃক্ষ আছে সেই বৃক্ষে অবস্থিত পাখির বাসা পর্যন্ত পানি পৌঁছে আর চড়ুই ছানা যেন পানি পান করতে পারে। ফিরিশতারা বলে, হে আল্লাহ্! সেই পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে গেলে তো সারা পৃথিবীই ডুবে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'লা উত্তর দেন, আমি পৃথিবীর ভ্রুক্ষেপ করি না, এখন আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর মানুষের ততটাও মূল্য নেই যতটা এই চড়ুই ছানার রয়েছে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৭-৬৯ থেকে সংকলিত)

অতএব যদিও এটি একটি কাহিনী কিন্তু এই কাহিনীতে শিক্ষনীয় দিক হলো, সত্য এবং সততা বিবর্জিত সারা বিশ্বের সকলে সম্মিলিতভাবেও খোদার দৃষ্টিতে এক চড়ুই ছানার সমান মূল্যও রাখে না।

অতএব আজ এই কাহিনী থেকে আমরা যেখানে এই কথা শিখতে পারি যে, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত সেখানে আমাদের নিজেদের এই আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্মজিজ্ঞাসাও করা উচিত যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি ধর্মকে জাগতিকতা বা পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার জন্য, নিজেদের অভ্যন্তরীন পাপ পঙ্কিলতা দূরীভূত করার জন্য এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কালের প্রবাহে আমাদের মাঝে উন্নতির পরিবর্তে যদি অবনতি হয়, আমরা যদি অধঃপতনের দিকে যাই তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ব। আর তখন খোদাও আমাদের প্রতি আর ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

অনুরূপভাবে এটিও আর কারো অজানা নয় যে, আজ পৃথিবীর অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। প্রায় দেশেই সরকার এবং জনসাধারণের কেউই পরস্পরের অধিকার প্রদান করে না এবং সেখানে অশান্তি ও নৈরাজ্য বিরাজমান রয়েছে। আর যেখানে বাহ্যত অশান্তি এবং নৈরাজ্য দেখা যায় না বা অবস্থা যেখানে খুব একটা অধঃপতিত বলে মনে হয় না সেখানেও খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ শুধু খোদা থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে না বরং আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে বাজে কথা বলে এবং অপালাপ করে তারা খোদাদ্রোহ করছে এবং খোদার অবমাননা করছে। আর একই সাথে নোংরামিতে তারা এতটাই নিমজ্জিত হচ্ছে যে, অস্বাভাবিক বা চরিত্র বিবর্জিত কার্যকলাপকে আইন করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে বরং বলা হয় যারা এসব নোংরা কাজের সমর্থন করে না আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অপরাধী। এই যে ভূমিকম্প, ঝড়, তুফান, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা এবং সীমাহীন বৃষ্টি যে ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে রেখেছে এর কারণ হলো পাপ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এটি তো এখনো কেবল সতর্কবাণী, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সাবধান করছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আহমদীদের কাঁধে এই গুরুভার বর্তায় যে, তারা যেন পৃথিবী বাসীকে সতর্ক করে এবং এটি বলে যে, সংশোধনের প্রতি যদি তারা মনোযোগ নিবদ্ধ না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক ধ্বংসাত্মক বিপদাপদ পৃথিবীতে নাযেল করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন পৃথিবীবাসী যেন নিজেদের কান্ডজ্ঞান খাটায়।

এরপর আমরা দেখি যে, বর্তমানের একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, আর চিরাচরিতভাবেই এটি চলে আসছে যে, মানুষ নিজের অধিকার দাবি করে, তা এর ফলে অন্যের যতই ক্ষতি হোক না কেন। এ সম্পর্কে একজন প্রকৃত মুসলমানের চিন্তাধারা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একটি ঘটনা এর জন্য সুন্দরভাবে পথের দিশা দেয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শোনাতেন যে, এক সাহাবী নিজের ঘোড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য এক সাহাবীর কাছে নিয়ে আসেন আর এর মূল্য দৃষ্টানস্বরূপ বলেন দুই শত রুপিয়া। দ্বিতীয় সাহাবী তখন বলেন যে, আমি এই মূল্যে এই ঘোড়া ক্রয় করতে পারি না কেননা এর মূল্য দ্বিগুণ। সেই সাহাবী প্রথম সাহাবীকে বলেন যে, ঘোড়ার বাজারদর সম্পর্কে আপনি মনে হয় অবহিত নন। কিন্তু ঘোড়ার মালিক সাহাবী এর চেয়ে বেশি মূল্য নিতে অস্বীকার করেন, তিনি বলেন, আমার ঘোড়ার মূল্য যেখানে এর বেশি নয় সেখানে আমি কেন এর চেয়ে বেশি মূল্য নেব। এটি নিয়ে তাদের তর্ক হতে থাকে। অবশেষে তারা শালিসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করান। তো এটি ছিল সেই ইসলামিক চেতনা এবং প্রেরণা যা এই দুই সাহাবী প্রদর্শন করেছেন। ইসলামী শিক্ষা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অধিকার নেওয়ার পরিবর্তে বা অধিকার দাবি করার ক্ষেত্রে নাছোড় আচরণ না করে অন্যের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এই চেতনাবোধ যদি জাগ্রত হয়,(সে যুগে অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে তখন স্ট্রাইক বা ধর্মঘট চলছিল, তো মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে,) যদি এই চেতনা সৃষ্টি হতো তাহলে স্ট্রাইক বা ধর্মঘট নিজেই বন্ধ হয়ে যেত। নূন্যতম নেকী হলো, কারো পক্ষ থেকে যখন অধিকারের প্রশ্ন উঠে তখন তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান করা উচিত। এটি অ-ইসলামিক মনোবৃত্তি যে, অন্যের অধিকারকে যেহেতু আমরা দীর্ঘকাল থেকে কুক্ষিগত করছি, সেটিকে ভোগ করছি, আর এটিকে নিজের অধিকার মনে করার এক মনোবৃত্তি আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়েছে তাই অন্যের প্রাপ্য আমরা তাকে দিতে পারি না।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৭থেকে সংকলিত)

এটি খুবই ভ্রান্ত একটি রীতি যা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। আজকালকার উন্নত বিশ্বেও হরতাল বা ধর্মঘটের অধিকার দেওয়া হয়েছে, আর তারাও কান্ডজ্ঞান না খাটিয়েই এমনটি করে আর এই চিন্তা করে না যে, এর সীমা কোথায় গিয়ে শেষ হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজকাল যুক্তরাজ্যে ডাক্তারদের ইউনিয়ন স্ট্রাইক করছে যার ফলে রোগীরা অত্যন্ত চিন্তিত। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য রোগীদের শুধু চিকিৎসা সুবিধা থেকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আমার মনে পড়ে যে, জাপান সফরের সময় খুবই ভদ্র এক খ্রিস্টান আমাকে প্রশ্ন করেন যে, শান্তির সংজ্ঞা কি? আর কিভাবে তা প্রতিষ্ঠা করা যায়? তিনি আরো বলেন, আমি আজ পর্যন্ত এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইনি যে, শান্তির সংজ্ঞা কি? আমি তাকে বললাম, আমি পূর্বেও এটি বলেছি যে, ইসলাম বলে যা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ কর। যদি এমনটি কর তাহলে তুমি পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। আর অধিকার যদি এভাবে নিশ্চিত কর তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, এভাবে তোমরা তখন পরস্পরের প্রতি শান্তির বার্তা প্রেরণ করবে। তিনি বলেন, এই সংজ্ঞা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে যা আমি প্রথমবার শুনেছি।

সুতরাং আজ কেবল ইসলামই সকল বিষয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারে কিন্তু এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ব্যতিরেকে আমরা পৃথিবীকে কোনভাবে এটি বোঝাতে সক্ষম হব না। অন্যের অধিকার কুক্ষিগত করার তো প্রশ্নই উঠে না। আমরা যদি নিজেদের বৈধ অধিকার ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই তাহলেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে আর শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এমনটি করা উচিত। আমরা বৈধ অধিকারও যদি ছেড়ে দিই তাহলে কিছুই যায় আসে না। এটি যদি হয়ে যায় তাহলে সমাজে যেহেতু উভয় পক্ষ থেকে অধিকার প্রদানের চেষ্টা থাকবে আর দ্বিতীয় পক্ষও যদি মু'মিন হয় তাহলে সেও অবৈধভাবে অন্যের অধিকার পদদলিত করার চেষ্টা করবে না। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো অনেক

সময় আমাদের বিচার বিভাগে এমন অনেক মোকদ্দমা বা মামলা আসে যে, ভাই ভাইয়ের অধিকারকে পদদলিত করে বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের প্রাপ্য অধিকারকে তারা কুক্ষিগত করে। আমরা যদি এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করি তাহলে আমাদের বিচার বিভাগের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা।

ঝগড়া বিবাদ নিরসনের জন্য ইসলাম কি শিক্ষা দেয়, ইসলামী চিন্তা চেতনা কেমন হওয়া উচিত, সাহাবীরা কেমন আদর্শ স্থাপন করেছেন তা আমাদের সামনে রয়েছে। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, একবার হযরত ইমাম হাসান এবং হোসেন-এর মাঝে কোন বিষয়ে বিতর্ক হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে অনেক সময় মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটেই থাকে বা বিতর্ক হয়ে যায়। হযরত ইমাম হাসান খুবই কোমলস্বভাবের এবং ভদ্র ছিলেন কিন্তু হযরত ইমাম হোসেন-এর রীতিতে আবেগপ্রবণতা ছিল। তাদের মাঝে যে বাক বিতন্ডা বা ঝগড়া হয় তাতে হযরত ইমাম হোসেনের পক্ষ থেকে অধিক কঠোরতা প্রদর্শিত হয় কিন্তু হযরত ইমাম হাসান ধৈর্য প্রদর্শন করেন। সেই বাক বতিন্ডা বা ঝগড়ার সময় কিছু অন্য সাহাবীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ঝগড়া যখন শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় দিন এক ব্যক্তি দেখে যে, হযরত ইমাম হাসান খুব দ্রুত পায়ে কোন দিকে ছুটে যাচ্ছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত ইমাম হাসান বলেন যে, আমি হোসেনের কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি বলেন, আপনি কেন ক্ষমা চাইতে যাচ্ছেন, ঝগড়ার সময় আমিও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম। আমি জানি হোসেন আপনার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। আপনার তার কাছে নয় বরং তার আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। হযরত ইমাম হাসান বলেন, আপনি ঠিক বলছেন তিনি আমার সাথে কঠের ব্যবহার করেছেন কিন্তু আমি ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি এই জন্য যে, এক সাহাবী আমাকে বলেছেন যে, একবার মহানবী (সা.) বলেন, দুই ব্যক্তির মাঝে যখন ঝগড়া হয় তখন তাদের মাঝে যে প্রথমে মী মাংসার হাত বাড়ায় সে দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি শুনে আমার হৃদয়ে এই প্রেরণা জাগ্রত হয় যে, গতকাল আমি হোসেনের কঠোর ব্যবহারের সম্মুখিন হয়েছি, তিনি আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন, এখন হোসেন যদি আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রথমে এসে যান আর মীমাংসা করেন তাহলে উভয় জগতেই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম, এখানেও আমার সাথে কঠোর ব্যবহার হলো আর পরকালেও আমি পিছিয়ে থাকলাম। তাই আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি যে, যে কঠোর ব্যবহারের সম্মুখিন আমি হয়েছি তা তো হয়েছি-ই, এখন আমি তার কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিব যেন এর বিনিময়ে তার পাঁচশত বছর পূর্বে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি।

(আল-ফযল, ২৩ শে মার্চ ১৯৪৪, পৃষ্ঠা-৪ থেকে সংকলিত)

অতএব এটি হলো সেই মনমানসিকতা যা আমাদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত ।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমি একটি কৌতুক শুনেছি যা সম্ভবত মোকামাতে হারীরি বা অন্য কোন গ্রন্থের একটি কাহিনী । তিনি (আ.) বলতেন, কোন জায়গায় কোন মেহমান গোসল করতে যান। হামামের মালিক মেহমানদের সেবার জন্য বিভিন্ন সেবক নিযুক্ত করে রেখেছিলেন। বিভিন্ন দেশে এমন হামাম থেকে থাকে যেখানে অনেক সেবক থাকে যারা মেহমানদের মালিশ করে গোসল করায়। তিনি বলেন, দৈবক্রমে তখন হামামের মালিক সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। মেহমান যখন গোসল করার জন্য হামামে প্রবেশ করে তখন সব সেবক একত্রে এসে তাকে ঘিরে ধরে। মাথা যেহেতু সহজেই মালিশ করা সম্ভব তাই সবাই একসাথে তার মাথা মালিশ করা আরম্ভ করে। একজন বলে যে, এটি আমার মাথা, দ্বিতীয় জন বলে যে, না আমার মাথা। এভাবে এটি নিয়ে ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। তখন একজন আরেকজনকে ছুরিকাঘাত করে যার ফলে সে আহত হয় এবং হৈচৈ হয় আর পুলিশ এসে যায়। অবশেষে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতের সামনেও এক চাকর বলছিল যে, এটি আমার মাথা আর দ্বিতীয় জন বলছিল যে, এটি আমার মাথা ছিল। যে গোসল করতে গিয়েছিল তাকে যখন আদালত থেকে জিজ্ঞেস করা হয় তখন সে বলে যে, হুযূর এদের তো কোন বোধ বুদ্ধি নেই, এদের কথা শুনে আমার আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো আপনিও আমাকে একই প্রশ্ন করলেন, অথচ মাথা এরও নয় আর ওরও নয় মাথা তো ছিল আমার।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই দৃষ্টান্ত এজন্য দিতেন যে, এই পৃথিবীর বা জাগতিক ঝগড়া বিবাদ অর্থহীন হয়ে থাকে। আমারই বা কী আর তোমারই বা কী, গোলাম বা দাস তো কিছুই নয়, সে যখন বলে বা দাবি করে যে, আমি আবদুল্লাহ্ এর অর্থ হলো যে, এখন তার নিজের আর কিছুই নেই। এক প্রকৃত মুসলমানের আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে আর এই ঘটনা সেই প্রেক্ষাপটেই তিনি বর্ণনা করছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে থাকে সে আমার এবং তোমার প্রশ্ন তোলে না, সে তো খোদা তা'লার বান্দা হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ্ যে হয় তার নিজের বলতে কিছুই থাকে না, সব খোদা তা'লার হয়ে থাকে। সে যখন প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায়, আব্দুল্লাহ্ যখন হয়ে যায় তখনসে বলে যে, সবকিছু আল্লাহ্‌র। আব্দুল্লাহ্‌র অর্থ হলো আল্লাহ্‌র বান্দা আর আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে গেলে সবকিছু আল্লাহ্ তা'লার হয়ে যায়। এখন তার নিজের যেহেতু আর কিছু নেই তাই এরপর আমার এবং তোমার এই বিতন্ডার বা বিতর্কের আর সুযোগ থাকে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কুরআন পাঠ করে দেখ, এতে রসূলে করীম (সা.)-এর নামও আব্দুল্লাহ্ রাখা হয়েছে। যেভাবে কুরআনে আছে 'লাম্মা ক্বামা আব্দুল্লাহ' (সূরা জিন্ন: ২০)। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হিসেবে আমাদের নিজেদের আর কিছুই থাকে না, সবই আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। এ কারণেই কুরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আমরা মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ এবং সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছি। এখানে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সবাই প্রাণ শব্দের অধীনে চলে আসে আর বাকি সমস্ত ধন-সম্পদ আসে মাল শব্দের অধীনে। মানুষ এই উভয় জিনিসেরই মালিক বা সত্তাধিকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা এই উভয় জিনিস মানুষের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছি, তাদের প্রাণও নিয়েছি আর সম্পদও। এর অর্থ হলো, তোমাদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ থাকা উচিত নয় এই মর্মে যে, এই জিনিসটি আমার বা সেই জিনিসটি তার, এই বিতন্ডায় লিপ্ত হয়ো না কেননা আমার তোমার আর কোন প্রশ্ন নেই। তোমরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা কর আর এসব বিতর্ক ছেড়ে দাও যে, অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট হলেন অমুক ব্যক্তি কেন হলেন না। (এখানে নির্বাচনের কথা হচ্ছে, ওহদাদারদের কথা বলা হচ্ছে। অনেকেই এই ঝগড়া আরম্ভ করে যে, অমুক ব্যক্তি কেন নামাযের ইমাম নিযুক্ত হলো, আমরা তার পিছনে নামায পড়ব না) অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলো, অমুক কেন হয়নি, অমুক কেন সেক্রেটারী মনোনীত হলো আমি কেন হলাম না বা যতক্ষন পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি ইমাম না হবেন আমরা অমুকের পিছনে নামায পড়তে পারি না।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৬ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭০-২৭১ থেকে সংকলিত)

এ কথাগুলো শুধু শোনার জন্য নয়। কেউ কেউ হয়তো ভাববেন যে, মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে এমন মানুষ ছিল, বর্তমান যুগে আর এমন মানুষ নেই। আজও এমন অভিযোগ এসে থাকে। সেই যুগে সাহাবীরাও জীবিত ছিলেন যারা এমন বক্র প্রকৃতির লোকদের সংশোধন করতেন। কিন্তু আমরা নবুওয়তের যুগ বা নবীর যুগ থেকে এখন ক্রমশ দূরে যাচ্ছি আর ভবিষ্যতে এই দুরত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই এদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। পূর্বেও এই বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে, আমাদের অনেক সাবধান হওয়া উচিত। আমাদের এই কথা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে পারি, আমরা কিভাবে নিজেদের হঠকারিতা এবং আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্ট করতে পারি। নির্বাচনের সময় এমন প্রশ্নাবলী উঠে থাকে যখন কোন সময় অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তখন মানুষ এমন প্রশ্নের অবতারণা করে। এই বছরটি আমাদের জামাতে নির্বাচনের বছর। এ বছর নির্বাচন হবে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবার উচিত নিজেদের চিন্তা-ধারার সংশোধন করা। দোয়ার পর সকল প্রকার সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের নির্বাচনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন, এরপর যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় তা সানন্দে গ্রহণ করুন। আমিত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত করুন। অঙ্গ সংগঠন গুলোর ক্ষেত্রেও এমন প্রশ্ন সামনে আসে। মাত্র দু'দিন পূর্বেই কোন একটি দেশের লজনা ইমাইল্লাহ্‌র নির্বাচন হয়, সেখান থেকে আমার কাছে পত্র এসে যায় যে, অমুককে কেন মনোনীত করা হলো, অমুককে কেন করা হলো না, এই তো এই মহিলা এমন। তো এমন আজেবাজে চিন্তাধারা থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। একটি নির্দিষ্ট কাল বা সময়ের জন্য যাকেই মঞ্জুরী দেওয়া হয় তার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত ।

আরেকটি কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, মু'মিনের উচিত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করা এবং বিষয়কে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো। কর্মকর্তা হোক বা কোন ওহদাদার হোক অন্যদের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে অর্থাৎ কর্মকর্তারা যেন কেবল অধীনস্তদের ওপরই নির্ভর না করে বরং তাদের নিজেরও সরাসরি সব কাজের নিগরানী এবং তত্ত্বাবধান করা উচিত, কাজে জড়িত থাকা উচিত, তাহলেই কাজ সঠিকভাবে সমাধা হওয়া সম্ভব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। তার অনেক বড় এক লঙ্গরখানা ছিল। গরীবদের একটি বিশাল শ্রেণী প্রতিদিন সেখানে খাবার খেত কিন্তু তাতে অনেক বিশৃঙ্খলা ছিল। সে ব্যক্তি সম্পদশালী ছিল কিন্তু তার মাঝে নিগরানী বা দেখাশুনার মনমানসিকতা ছিল না। আর কর্মচারীরা ছিল বিশ্বাসঘাতক এবং দুর্নীতিবাজ। যারা বাজার করতো তারা দামী জিনিস নিয়ে আসতো আর পরিমাণে কম আনতো। আর কিছুটা নিজেদের ঘরে নিয়ে যেত। আর যারা খাবার রান্না করতো তারা কিছু নিজেরা খেয়ে ফেলতো, কিছুটা আত্মীয় স্বজনকে খাইয়ে দিত আর কিছু নষ্ট করতো। অনুরূপভাবে স্টোর রুম খোলা থাকতো আর সারা রাত কুকুর এবং খেকশিয়াল সেই সব খাদ্য শস্য খেতো এবং নষ্ট করতো। ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, সেই ব্যক্তি ঋণে জর্জরিত হয়ে যায় আর কুড়ি বছরের বিশৃঙ্খলার পর তাকে জানানো হয় যে, তুমি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছ। সে যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে উদার ছিল তাই সে লঙ্গরখানা বন্ধ করতে চায়নি। কিন্তু ঋণ পরিশোধের চিন্তাও তার ছিল। সে তার বন্ধু বান্ধবদের ডাকে। সে নিজের দোষ ত্রুটির কথা তাদেরকে কিছুই বলেনি আর কেউ বলেও না। সে সবাইকে বলে যে, আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। তারা সবাই বলে যে, স্টোররুমের কোন দরজা নেই, সারা রাত খেকশিয়াল এবং কুকুর খাদ্য-দ্রব্য এবং শস্যদানা ইত্যাদি নষ্ট করতে থাকে তাই অনেক জিনিস নষ্ট হয়। স্টোরে যদি দরজা লাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অনেকটা সাশ্রয় হওয়া সম্ভব। অতএব সে নির্দেশ দেয় যে, দরজা লাগিয়ে দেওয়া হোক এবং দরজা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এটি একটি কাহিনী মাত্র আর কাহিনীতে কুকুর আর খেকশিয়ালও কথা বলে। বলা হয় যে, রাতের বেলা কুকুর এবং খেকশিয়ালরা স্টোর রুমের দরজা বন্ধ দেখে এবং অনেক হট্টগোল করে। হঠাৎ বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ কোন কুকুর বা শিয়াল সেখানে আসে আর জিজ্ঞেস করে, তোমরা হৈচৈ কেন করছো? অন্যরা উত্তর দেয় যে, স্টোর রুমে দরজা লেগে গেছে, এখন আমরা খাব কোত্থেকে? আমাদের এলাকার সব কুকুর ও খেকশিয়াল এখান থেকেই খাবার খেতো। সে বলে যে, তোমরা অনর্থক হৈচৈ করছো আর সময় নষ্ট করছো। যে ব্যক্তি বিশ বছর পর্যন্ত নিজের ঘর লুটপাট হতে দেখেছে এবং সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেয়নি তার স্টোরের দরজা কে বন্ধ করবে? সে নিজে তো আর এর তত্ত্বাবধান করবে না তাই চিন্তার কিছু নেই।

এই কাহিনীতে এটি বলা হয়েছে যে, 'যদি চায়' এবং 'সত্যিকার অর্থে চাওয়া'র মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। কুকুর এবং খেকশিয়ালরা হৈচৈ করে যে, যদি সে চায় আর দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে খাব কোত্থেকে? আর এদের মাঝে যে অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক নেতা ছিল সে বলে যে, এই সম্পদশালী ব্যক্তি এদিকে মনোযোগই দিবে না, সে চাইবেই না, তাই হৈচৈ করার কি আছে। এটি বর্ণনা করার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমাদের জামাতের সদস্যরা যদি না চায় তাহলে কিছু হওয়া সম্ভব নয় কিন্তু তারা যদি চায় তাহলে অনেক কঠিন কাজও স্বল্পতম সময়ে করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমাদের শৈশবের বিভিন্ন কল্প-কাহিনীর মধ্যে আলাদিনের প্রদীপের কাহিনীও অনেক প্রসিদ্ধ। আলাদিন এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিল, তার হাতে একটি প্রদীপ আসে, সে যখনই সেই প্রদীপ ঘর্ষণ করত এক দৈত্য সামনে আসত, এটি শিশুদের একটি কাহিনী, সেই দৈত্যকে সে যা-ই বলত সে তাৎক্ষণিকভাবে তার সামনে তা উপস্থিত করত, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে তাকে রাজ প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিলে সে নিমিষেই রাজ প্রাসাদ নির্মাণ করত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা সেই সময় মনে করতাম যে, আলাদিনের প্রদীপের ঘটনা এক সত্য ঘটনা কিন্তু যখন বড় হই আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এটি শুধু কল্পকাহিনী। কিন্তু যৌবন থেকে যখন বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, এই কথা সঠিক। এখানে বসে অনেকেই হয়তো চিন্তা করবে যে, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কিভাবে বলছেন যে, এটি সঠিক। তো আলাদিনের প্রদীপ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু সেই প্রদীপ তেলের প্রদীপ নয় বরং তা দৃঢ় সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ হয়ে থাকে। খোদা তা'লা যাকে সেই প্রদীপ দান করেন সে সেই প্রদীপকে কাজে লাগায় আর যেহেতু সংকল্প এবং প্রত্যয় খোদা তা'লার গুণাবলীর অন্তর্গত বিষয়, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা 'কুন' বললে কাজ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে তাঁর নির্ধারিত নীতির অধীনে তাঁর নির্দেশাবলী মান্য করে, (এগুলো সব হলো শর্ত) তাঁর কাছে দোয়া করে, তাঁর সাহায্য যাচনার মাধ্যমে কোন মানুষ যদি 'কুন' বা হও বলে তা হয়ে যায়। এক কথায় শৈশবে আলাদিনের প্রদীপে আমরা বিশ্বাসী ছিলাম কিন্তু যৌবনে আমাদের সেই ধারণা কিছুটা দ্যেদুল্যমান হয় কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভের পর বুঝতে পেরেছি যে, আলাদীনের প্রদীপের কাহিনী সত্য কিন্তু এটি একটি রূপক ঘটনা আর সেই প্রদীপ পিতলের নয় বরং তা সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ, এটিকে যখন ঘর্ষণ দেওয়া হয় কাজ যত বড়ই হোক না কেন স্বল্পতম সময়ে সেই কাজ সম্পন্ন হয়।

(আল-ফযল, ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬২, পৃষ্ঠা-২-৩)

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা এমনই হওয়া উচিত যে, আমরা শুধুমাত্র যদি চাই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকব না বরং আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে চাইতে হবে আর এর সাথেই নিজের সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করে কাজ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে। কেউ কেউ এমনও আছে যারা চায়, অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, চাওয়া সত্ত্বেও কাজ হয় না তাই তাদের সেই ইচ্ছা এবং চাওয়াতে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকে না। এই চাওয়ার সাথে চাওয়ার যে অনুসঙ্গ আছে তা থাকে না অর্থাৎ সংকল্প, প্রত্যয় থাকে না, পরিশ্রম করা হয় না, শুধু মনে মনে চায় আর চাওয়াই সার।

আমি এই বিষয়টা নিচ্ছি, নামাযের প্রশ্ন যখন আসে, অনেকে আমার কাছে এসে বলে যে, দোয়া করুন, আমরা রীতিমত নামায পড়তে চাই কিন্তু আমরা রীতিমত নামায পড়তে পারি না, অন্য কাজ যখন চাই তা করে নিই কিন্তু নামাযও পড়তে চাই। তারা যেহেতু পুরো আন্তরিকতার সাথে চায় না, এর জন্য সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করে না এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চায় না তাই নামাযের অভ্যাস রপ্ত হয় না, এমন লোকদের চাওয়া আসলে না চাওয়ারই নামান্তর। হতেই পারে না যে, মানুষ কোন কাজ করতে চায় আর সেই কাজ হবে না। নামায সত্যিকার অর্থে তাদের জন্য একটি গৌণ বিষয়, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জাগতিক কাজ, সে কারণে নামাযের ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এটি কিভাবে সম্ভব যে, মানুষ কোন কাজ করতে চাইবে আর কাজ করার দৃঢ় সংকল্পও থাকবে আর সে কাজ হবে না? তাই আসলে মানুষের নিজেরই আলস্য হয়ে থাকে এবং ঔদাসিন্য থেকে থাকে যেটিকে অনর্থক চাওয়ার বা ইচ্ছার নাম দেওয়া হয়।

তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমরা শৈশবে একটি কাহিনী শুনতাম যা শুনে আমরা হাসতাম অথচ তা হাসির জন্য নয় বরং ক্রন্দনের জন্য সেই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আর এতে বর্তমান যুগের মুসলমানদের চিত্র অংকন করা হয়েছে, কিন্তু এই কাহিনী যিনি শুনিয়েছেন তিনি ইঙ্গিতে মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরেছেন যেন মৌলভী তার পিছু ধাওয়া না করে। কোন আহমদী যদি এমন কাজ করে তাহলে তাকেও আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। সেই কাহিনী হলো, কোন দাসী ছিল যে সেহরীর সময় রীতিমত উঠতো। সে কারোর চাকরানী ছিল। কিন্তু সে রোযা রাখতো না। ঘরের মালকিন মহিলা ভাবেন যে, সে কাজে সাহায্যের জন্য আসে কিন্তু সে যেহেতু রোযা রাখতো না তাই ঘরের মালিক চিন্তা করলেন যে, একে অনর্থক সেহরীর সময় কষ্ট দেওয়ার প্রয়োজন কি, সেই সময়ের কাজ আমি নিজেই করব। দু'চার দিন পর সেই ঘরের মালিক বলেন যে, তুমি সেহরীর সময় উঠো না, আমি নিজেই কাজ সেরে নিব, তোমার কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। এই কথা শুনে সেই মেয়ে বিস্ময়ের সাথে ঘরের মালিক মহিলার দিকে তাকায় এবং চিন্তা করে যে, বলছে কি। সেই মেয়ে বলে যে, বিবি! আমি নামায তো পড়ি না, রোযাও রাখি না, যদি সেহরীও না খাই তাহলে কি কাফের হয়ে যাব না? সত্যিকার অর্থে এটি প্রতিকী ভাষায় সেই সকল লোকদের অবস্থার চিত্র অংকন করা হচ্ছে যারা নামায পড়ে না। তিনি বলেন, তুমি অন্য ভাষায় এটি বলতে পার যে, যদি মুসলমানদের বলা হয়, জুমুআতুল বিদার প্রেক্ষাপটে কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক জুমুআ এবং প্রত্যেক অবস্থার ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য, যদি বলা হয় যে, মিঞাঁ জুমুআতুল বিদা পড়ে লাভ কি, কেন নিজেকে কষ্ট দাও এই বাহানায়। বাকী জুমুআ যেহেতু পড়নি তাই এই জুমুআও পড়ার দরকার কী। তখন সে বিস্ময়ের সাথে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর বলবে যে,ভাইজান, আপনি বলছেন কী। আমরা দৈনিক নামাযের জন্য মসজিদে যাই না, রোযা রাখি না, জুমুআতুল বিদাও যদি না পড়ি, তাহলে তো কাফের হয়ে যাব। তো এটিও একটি হাস্যকর বিষয় যে, একবেলা এসে নামায পড়ে মনে করা বসলাম যে, আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে ফেলেছি, এটি তাদের জন্য, যারা মনে করে মসজিদে গিয়ে একটি নামায পড়ে ফেললাম আর ফরয দায়িত্ব পালন হয়ে গেল আর এটিই যথেষ্ট।

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৩ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৩৮-৪৩৯)

সুতরাং যারা রীতিমত নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে না তারা এমন লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত। পাঁচ বেলার নামায প্রত্যেক সাবালক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। পুরুষদের জন্য মসজিদে এসে বা জামাতের সাথে নামায পড়া আবশ্যক, এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত বা এটি বল যে, আমরা সাবালক নই বা এটি বলা উচিত যে, আমাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই, তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু এই উভয় কারণ যদি না থাকে সর্বত্র জামাতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা থাকা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে,

আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিজেই শুনেছি যে, যখন কোন বাদশাহ্ বা সম্পদশালী ব্যক্তি কোন স্থানে যায় তার আরদালী বা পিয়নও তার সাথে যায়, হুযূরের রচনাবলীতেও এই কাহিনী দেখা যায়, সে যেহেতু তখন সাথেই থাকে তাই তার ভিতরে যাওয়ার জন্য তখন আর অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আজকালও দেখুন যে, যখন মন্ত্রী বা অন্য কোন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আসে তখন প্রটোকল অনুযায়ী তার অধীনস্ত কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা রক্ষীরা সকলেই যায়। তাদের আসার আলাদা অনুমতি নিতে হয় না, যেমন ওয়াইসরয় যদি কোন গভর্ণরকে তলব করে, (সেই যুগে ভারতে বা পাকিস্তানে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল এবং সেই অঞ্চলে ওয়াইসরয় ছিল,) তো তিনি অর্থাৎ ওয়াইসরয় যদি কোন গভর্ণরকে তলব করে তখন গভর্ণরের আরদালি বা হকারী না ডাকলেও গভর্ণরের সাথেই যাবে আর তার নিরাপত্তা রক্ষী এবং সেবকরাও সেই আমন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি বলে, অনুরূপভাবে তোমাদের অবস্থাও যতই নিম্নমানের হোক না কেন যদি ফিরিশতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর তাহলে তারা যেখানেই যাবে তোমরা তাদের সাথে যাবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে যদি সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহরে তাঁর ফিরিশতাদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে ওঠবে আর তোমরা তাঁর আরদালি বা সহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, তারা যদি মানুষের হৃদয় ও মনমস্তিষ্কে প্রবেশ করে তোমরাও তাদের সাথে যাবে। তিনি বলেন, এই অসাধারণ শক্তিকে বোঝার চেষ্টা কর যা খোদা তা'লা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের শক্তি আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্ক রাখে, তোমরা একে দৃঢ় করার জন্য ফিরিশতাদের সাথে যত বেশি সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় গড়ে তুল যেন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি অর্জন কর। যদি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছার শক্তি অর্জন কর তাহলে সকল পর্দা ছিন্ন হবে আর খোদার নূর বা জ্যোতি যেখানে পৌঁছবে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জলসায় আগমনকারীদেরকে তখন নসীহত করেন যে, তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও, যেই আগ্রহের সাথে এখানে এসেছ সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সকল চেষ্টা কর। এমনটি যেন না হয় কুশতি (মল্ল যুদ্ধ) দেখার জন্য কিছু মানুষ যেভাবে প্রথমে এসে যায় তোমরাও সেভাবেই এসেছ, এমন হওয়া উচিত নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার ফলে আল্লাহ্‌র ফিরিশতাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর এই আধ্যাত্মিকতা তখন মানুষের মন-মস্তিষ্কে যে প্রভাব ফেলবে এর ফলশ্রুতিতে তোমাদের কাজ ফিরিশতারাই করবে। আর যেখানেই তারা পৌঁছবে সেখানে তোমাদের নামও পৌঁছবে কেননা তোমাদের উদ্দেশ্য নেক, পুতঃ-পবিত্র আর তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবে।

(আল-ফযল ৯ জানুয়ারী, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা- ৩)

তাই এই মৌলিক নীতিকে আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা যখন কোন জায়গায় সমবেত হই, সেটি জলসা হোক বা ইজতেমা, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যখন আমরা সমবেত হই সেখানে আমাদের সেই লক্ষ্য অর্জনের সকল চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের মজলিসকে সাময়িক আধ্যাত্মিক বৈঠক নয় বরং তাতে যেন স্থায়ী আধ্যাত্মিক বৈঠকের পরিবেশ এবং প্রভাব থাকে, আর ফিরিশতারাও যেন আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যায়, যেখানে আমরা চেষ্টা করব সেখানে ফিরিশতারা এসে যেন প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসু করে।

সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, সত্যিকার মু'মিন সে, যে নেক কাজ করে, পূর্বের চেয়ে অধিক নেক কাজ করলে পূর্বের চেয়ে অধিক বিনয় এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদার কাছে অধিক নেক কর্মের দোয়া করা উচিত এবং এক মু'মিন তাই করে থাকে, যেন এই ধারা অব্যাহত থাকে আর তার পরিণাম শুভ হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, কোন কোন সাহাবী বলেন, আমরা যখন মহানবী (সা.)-কে দোয়া করতে দেখতাম তখন আমাদের এমন মনে হতো যেন এক হাঁড়িতে পানি ফুটছে। সুতরাং আত্ম-সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ কর, পবিত্র হও। এই কথা ভেবো না যে, তোমরা নেক কাজ করছ, সবচেয়ে বড় পুণ্য কর্মের ফলেও ঈমানহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)বলতেন, জানি না কেন আজকাল মানুষ হজ্জ করে আসে কিন্তু তাদের হৃদয়ে পূর্বের চেয়ে বেশি অহংকার, আত্মশ্লাঘা এবং পাপ দানা বাঁধে এর কারণ হলো, হজ্জের প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ এরা বোঝে না। আধ্যাত্মিকভাবে বিন্দুমাত্র লাভবান হওয়ার পরিবর্তে শুধু হজ্জের কারণে তারা অহংকার প্রদর্শন আরম্ভ করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি কাহিনী শুনাতেন যে, এক বৃদ্ধা শীতের রাত্রিতে ষ্টেশনে বসে ছিলেন, কেউ তার চাদর নিয়ে নেয়, তার যখন শীত লাগে সে চাদর পরতে গিয়ে দেখে চাদর নেই, এটি দেখে সে চিৎকার করে বলে ভাই হাজী আমার শুধু একটিই চাদর ছিল আর আমার এটির প্রয়োজন আছে, আমাকে সেটি ফেরত দাও। সে পাশেই বসে ছিল, নিয়ে চলে যায় নি, নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিল। এটি শুনে যে ব্যক্তি চাদর নিয়ে গিয়েছিল সে লজ্জিত হয় আর চাদর সেখানেই রেখে দেয় এবং একই সাথে তাকে এটি জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কিভাবে জানতে পারলে, যে চাদর চুরি করেছে সে একজন হাজী? সেই মহিলা বলেন যে, এই যুগে এমন পাষণ্ডতা হাজীরাই প্রদর্শন করতে পারে।

অতএব এই কথা ভেবো না যে, আমরা নেক কাজে নিয়োজিত, এই কথা ভেবো না যে, আমরা পূত সংকল্প রাখি, মানুষ যত নেক কাজই করুক না কেন তা থেকেও পাপের সূচনা হতে পারে। মানুষের সংকল্প যতই নেক হোক না কেন তা তার ঈমানকে বিকৃত করতে পারে। ঈমান আমাদের কর্মের ফলে লাভ হয় না বরং খোদা তা'লার করুণার ফলে লাভ হয়, এটি একটি মৌলিক কথা যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের কর্ম যতই হোক না কেন খোদার দয়া যদি না হয়, তাঁর কৃপা যদি না থাকে, ঈমান কোনও ভাবেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তাই সব সময় খোদার দয়ার ওপর দৃষ্টি রাখ আর তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় তাঁর পবিত্র হাতের দিকে যায়, কেননা যে ভিখারী এই বিশ্বাস রাখে যে, খোদার দ্বার পরিত্যাগের পর আমার জন্য অন্য কোন দ্বার খুলতে পারে না এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় খোদার প্রতিই নিবদ্ধ হয়। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে ততক্ষণ নিরাপদ থাকবে, কেননা যার চোখ খোদার সত্ত্বায় নিবদ্ধ আর খোদার দিকে চেয়ে থাকে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। যখনই দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো হয় আর খোদার দরজা থেকে সে যদি চলে যায়, তার সংকল্প যতই পূত হোক না কেন, সে যত ভালো কাজই করুক না কেন তার কোন ঠিকানা নেই বরং শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে সে আশ্রয় নেয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৬-২১৮)

তাই স্থায়ীভাবে তওবা, ইস্তেগফার, তাঁর কৃপারাজী যাচনা করা, তাঁর ফযল আকর্ষণ করা এই সব বিষয়ই শুভ পরিণাম এবং পরিনতির দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ঘটনা শুনাতেন, তিনি বলতেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে বা হযরত ওমর (রা.)-এর ঘরে, আমার সঠিক মনে নেই, চুরি হয়, তার কোন গহনা চুরি করা হয়। তাঁর এক সেবক ছিল, যে তোলপাড় আরম্ভ করে বলতে থাকে যে, এমন দূর্ভাগাও কি পৃথিবীতে আছে যে কি না আল্লাহ্‌র খলীফার ঘরেও চুরি করতে দ্বিধা করে না! যে চুরি করেছে, তাকে সে অনবরত অভিশাপ দিচ্ছিল আর বলছিল যে, আল্লাহ্ তার চুরি প্রকাশ করুন, তাকে লাঞ্ছিত করুন। অবশেষে তদন্ত করতে করতে জানা যায় যে, সেই গহনা এক ইহুদীর ঘরে বন্ধক রাখা হয়েছে। সেই ইহুদীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই গহনা কোথায় পেয়েছ, সে সেই চাকরের কথাই বলে যে হৈ চৈ করছিল আর চোরকে অভিশাপ দিচ্ছিল।

অতএব মৌখিকভাবে আনুগত্য করা বা মৌখিকভাবে অভিশাপ দেওয়া কোন অর্থ রাখে না, আসল জিনিস হলো কর্ম। মৌখিকভাবে যে আনুগত্যের দাবি করে সে অনেক সময় সবচেয়ে বড় মুনাফিক বা কপটও হতে পারে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৬)

তাই এটি সত্যিই চিন্তার বিষয় আর এদিকে সবসময় আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা চাই।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় আহমদীয়াতের এক শত্রু যে কিনা বড় বড় বুলি আওড়িয়ে ছিল যে, আমরা আহমদীয়াতকে পিষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার কথা বলতে গিয়ে তিনি (রাঃ) বলেন, আমিও তাকে এই উত্তর দিতে পারতাম যে, তুমি পিষ্ট করে দেখাও। কিন্তু তা না করে আমি তাকে বলেছি, কাউকে নিশ্চিহ করা বা না করা বা কাউকে প্রতিষ্ঠিত রাখা বা স্থায়ীত্ব দেওয়া এটি খোদা তা'লার নিয়ন্ত্রণে। যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিশ্চিহ করতে চান তাহলে আপনাদের চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি নিজেই নিশ্চিহ করবেন। কিন্তু তিনি যদি আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না। তাক্বওয়াই মানুষকে এমন মিথ্যা আস্ফালন থেকে বিরত রাখে। তাই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি এই উত্তর দিয়েছি যে, আমাদের কিছু করার কোন শক্তি নেই কিন্তু আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে স্থায়ীত্ব দিতে চান, প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না। তিনি বলেন, তাক্বওয়াই মানুষকে এমন মিথ্যা আস্ফালন থেকে বিরত রাখে। এমন মিথ্যা আস্ফালন করে লাভ কী?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, কাদিয়ানে বা অন্য কোন স্থানে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Tel : +91 9417020616
Mobile: +91 9679481821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 17 March 2016 Issue No. 2

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

ভয়াবহ আন্ত্রিকের প্রকোপ দেখা দেয়, এক জানাযার সময় এক ব্যক্তি বলা আরম্ভ করে যে, এরা নিজেরাই মরে। আন্ত্রিকের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, মানুষ তবু খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত হয়না আর পেট ভরে খায়, এটিও চিন্তা করে না যে, এটি আন্ত্রিকের কাল। যে এই কথা বলছিল, সে বলে যে, আমরা শুধু একটি ছোট চাপাতি বা রুটি খাই কিন্তু এই হতভাগারা পেটপুরে খায় এবং এর ফলে কলেরায় মারা যায়। দ্বিতীয় দিন আরো একটি জানাযা আসে। কেউ জিজ্ঞেস করে যে, এই জানাযা কার? সেখানে মানুষ তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে যায়, তখন আরেক ব্যক্তি 'এই জানাযা কার?' এই প্রশ্ন শুনে এর উত্তর দিতে গিয়ে বলে যে, এই জানাযা সেই ব্যক্তির যে শুধু একটি চাপাতি খায়। সুতরাং এমন দাবি করে লাভ কী যে, আমরা এই করব বা সেই কবর, হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা যা বলেন, তা আমরা বলতে পারি যে, এমনটি হয়ে যাবে। বিনয়ের অর্থ এই নয় যে, খোদা যা বলেন তা গোপন করব, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (সূরা মুজাদেলা: ২২) অর্থাৎ আমরা এটি অবধারিত করে রেখেছি যে, আমরা এবং আমাদের রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হব। যদি কেউ আমাদেরকে বলে যে, আমরা তোমাদেরকে পিষ্ট করব তাহলে আমি বলবো যে, আমার শক্তির যতটুকু সম্পর্ক আছে আমি কিছু বলতে পারি না কিন্তু এই শব্দ যদি আহমদীয়াত সম্পর্কে বলা হয় তাহলে এটি কখনও হতেই পারে না। আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিতে আমাদের ততটা বিশ্বাস রয়েছে যতটা আমাদের নিজেদের প্রাণের ওপরও নেই। সুতরাং আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। আমাদের জীবদ্দশায় আসুক বা পরে কিন্তু এই বিজয়ের অংশ হওয়ার জন্য আমাদেরকে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যেন বংশ পরম্পরায় এটি প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের যুগে যদি বিজয় না আসে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সেই বিজয় দেখে।

দোয়া কিভাবে করা উচিত আর আহমদীরা যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন তা থেকে উত্তরণ কিভাবে সম্ভব এর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, পৃথিবীতে ভালোবাসার সর্বত্তোম বহিঃপ্রকাশ সেটিই হয়ে থাকে যা মা তার পুত্রের সাথে বা সন্তানের প্রতি প্রদর্শন করেন। প্রায় সময় মায়ের বক্ষের দুধ শুকিয়ে যায় কিন্তু শিশু যখন ক্রন্দন করে তখন দুধ নেমে আসে। সুতরাং যেভাবে শিশুর ক্রন্দন ছাড়া মাতৃবক্ষে দুধ আসতে পারে না অনুরূপভাবে খোদা তা'লা তাঁর রহমতকে বান্দার ক্রন্দন এবং আহাজারিরসাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। বান্দা যখন আহাজারি করে রহমতের দুধ নেমে আসে। তো আমি যেভাবে বলেছি, আমাদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত কিন্তু সেই চেষ্টা নয় যা মোনাফিকরা করে থাকে। যত বেশি দোয়া করা যায় আমাদের করা উচিত। দোয়াকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তখন তাহরীক করেছিলেন যে, ৭টি রোযা রাখুন আর দোয়া করুন। কয়েক বছর পূর্বে আমিও জামাতকে রোযা রাখার কথা বলেছিলাম যে, রোযা রাখা উচিত।

(খুতবাতে মাসরূর, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫০১-৫০২)

আর জামাতে আজও কেউ কেউ এমন আছে যারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারা রোযা রাখে। আমাদের এখন অন্তত পক্ষে সপ্তাহে একটি করে হলেও বিশেষভাবে ৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত ৪০টি রোযা রাখা উচিত। আর দোয়া করুন, নফল পড়ুন এবং সদকা দিন কেননা কোন কোন স্থানে জামাত এখন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখিন, কোন কোন জায়গায় পরিস্থিতি কঠিনতর হচ্ছে। আমরা যদি আল্লাহ্‌র দরবারে আহাজারী করি তাহলে যেভাবে বাচ্চার ক্রন্দনে মায়ের বক্ষে দুধ নেমে আসে তেমনিভাবে আমাদের প্রভুর সাহায্যও আকাশ থেকে নাযেল হবে আর সেই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা যা আমাদের পথে বিরাজমান তা দূর হবে। পূর্বেও দুরীভূত হয়েছে আর এখনও তা দুরীভূত হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কিছু সমস্যা এমন রয়েছে যা দুরীভূত করার শক্তি আমাদের হাতে নেই। শত্রুর মুখ আমরা বন্ধ করতে পারি না। তাদের কলমকে আমরা বাধাগ্রস্ত করতে পারি না। তাদের মুখ এবং কলম থেকে এমন কিছু বের হয় যা শোনা এবং পড়ার শক্তি আমাদের নেই আর আজকাল আমরা যখন দেখি যে, অত্যন্ত নোংরা ভাষায় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো অথচ তখন ইংরেজদের রাজত্ব ছিল কিন্তু তখনও সেই কথা গ্রহণ করা হতো না আর তারা সেভাবেই শুনতো যেভাবে এক বধিরের কানে কথা পৌঁছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, একই কথা যা মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে এখন বলা হয় তা সেই যুগেও বলা হতো, অন্য কারো সম্পর্কে যদি তখন এমনভাবে বলা হতো তাহলে দেশে আগুন লেগে যাওয়ার কথা কিন্তু সেই সব কথা অবিরতভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে আওড়ানো হয়, কিন্তু যারা এমন কথা বলে তাদেরকে ধৃত করা হয় না। অথচ আমরা এই রিপোর্টও পেয়েছি, সেই যুগের কথা যে, কোন কোন বিরোধী পরিমন্ডলে এটিও বলা হয় যে, সরকারী কর্মকর্তারা আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছে, আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে লেখ, তোমাদের কিছুই বলা হবে না।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১৫২-১৫৩)

আমাদের সাথে সব সময় এমন ব্যবহার হয়ে আসছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার মুখে ছাই দিয়ে জামাত উন্নতি করে চলেছে। এটি সেই সরকারের অবস্থা ছিল যেই সরকার জামাতের বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করেনি। পাকিস্তানে তো আহমদীদের বিরুদ্ধে আইনও রয়েছে আর সেই আইন বিরোধীদের সাহায্যও করে থাকে আর তারা যা ইচ্ছে তাই করে। মুখে যা আসে, যে অপলাপ করতে হয়, বাজে কথা বলতে হয়, মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে তারা বলে। আহমদীদেরকে যুলুম এবং নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয় আর আদালতও এখন শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে তারা শাস্তি দিয়ে থাকে, এর জন্য খোদার দরবারে অনেক বেশি আহাজারী এবং ক্রন্দনের প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের এ দিকে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে খোদা তা'লার দরবারে ঝুকুন, নফল পড়ুন, সদকা দিন, রোযা রাখুন। দোয়া ছাড়া এবং খোদার রহমতকে আহ্বান করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। আল্লাহ্ তা'লা সেই সকল আহমদীদেরকে, যেখানে যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে বা যেসব দেশে হচ্ছে বা যেসব স্থানেই এই যুলুম এবং অত্যাচার আর নির্যাতন চলছে, এমন দোয়া করার তৌফিক দিন যা খোদার আরশকে প্রকম্পিত করবে আর মোটের ওপর সারা পৃথিবীর আহমদীদের জামাতের উন্নতি এবং যুলুম আর নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

প্রথম পাতার পর

তা'লা 'পুত্র' শব্দ কি এই বলিয়া বাতিল করেন নাই যে, তোমরা কুফরী কথা বলিতেছ? করং খোদা তা'লা বলেন, যদি তোমরা খোদার প্রিয় হইয়া থাক তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে শাস্তি দেন কেন? উপরন্তু পুত্র শব্দটি দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের কেতাবসমূহে খোদার প্রিয়জনদিগকে পুত্ররূপে সম্বোধন করা হইত।

এই সকল বর্ণনার পিছনে আমার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ ত'লাা কাহাকেও ভালবাসার জন্য এই শর্ত রাখিয়াছেন যে, এইরূপ ব্যক্তিকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুবর্তিতা করিতে হইবে। বস্তুত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর খাঁটি অন্তকরণে অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রতি ভালবাসা পরিণামে মানুষকে খোদার প্রিয় বানাইয়া দেয়। ইহা এই ভাবে হয় যে, এইরূপ অবস্থায় তাহার নিজের হৃদয়ে খোদা প্রেমের একটি দহন সৃষ্টি হয়। তখন এইরূপ ব্যক্তি সব কিছু হইতে নির্লিপ্ত হইয়া খোদা-প্রেমের একটি বিশেষ বিকাশ হয় এবং খোদা তাহাকেপূর্ণ মাত্রায় প্রেম ও ভালবাসার রং দান করিয়া আবেগের শক্তি সহ নিজরে দিকে আকর্ষণ করেন। তখন সে প্রবৃত্তির আবেগের উপর জয় লাভ করে এবং তাহার সাহায্য ও সমর্থনে সবদিক হইতে খোদা তা'লার অলৌকিক ক্রিয়া নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়।

(হাকীকাতুল ওহী, রুহানী খাযায়েন, ২২ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬৫-৬৭)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian,
Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir